চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধন - অজেয় রায়
Chowdury Barir Guptadhon by Ajeo Ray
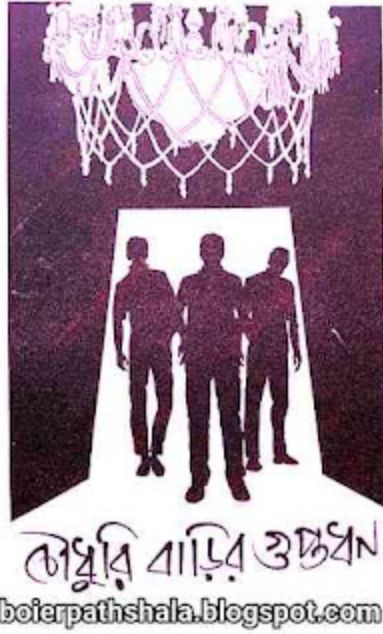
এক

দুপুর প্রায় দুটো। চড়া রোদ। একটা শুড়ি পথ দিয়ে গোপনে শিব চৌধুরির বাগানে ঢুকল। মাথার ওপর বড় বড় গাছের ডালপাতার ঠেসাঠেসি। পথের দুপাশ থেকে ঠেসে এসেছে ঝোপঝাড়আলকুশি, বিছুটি, বুনোকুল। এইসব গাছের ডালপাতা লাগলে গা ছিড়ে যায়, চুলকায়, জ্বলে। শিবের হাতের একটা ধারালো কাস্তে। বিপজ্জনক গাছের ডাল সমেত পড়লেই এক কোপে উড়িয়ে পথ সাফ করে। বিষাক্ত সাপ কম নেই এখানে। হাতে তাই অস্ত্র থাকা ভালো।

বৈশাখ মাসের গোড়া। ঝোপঝাড় কম। বর্ষা এলে এ পথে যাওয়াই যায় না। চলতে চলতে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে থামল শিব। চারপাশে কয়েকটা মোটা মোটা গাছের গুড়ি খাড়া উঠেছে। তাদের মাঝে মাটিতে বুনো ঝোপ প্রায় নেই। খানিকটা গোল জায়গা সান বাঁধানো। মাঝে ছোট পাথরের বেদি। তারই ওপর পা গুটিয়ে বসে শিব তাকাতে থাকে চারধারে।

আঃ কী সব গাছ! আম, কাঁঠাল, জামরুল, সবেদা, নারকেল—কী নেই! সব সেরা জাতের।

আমই আছে অন্তত পাঁচরকম। এমন ল্যাংড়া এই তল্লাটে আর নেই। প্রায় দশ বিঘা এলাকা জুড়ে বাগান।

মাঝখানে বিশাল চৌধুরি বাড়ি। চারধারে ইটের পাঁচিল ছিল। এখন সে পাঁচিলের অনেক অংশই ভাঙা। যেকোনো দিক দিয়েই ঢোকা যায় বাগানে, বাড়ির এলাকায়।

বাড়ির পশ্চিমে আর উত্তরে ফলের গাছ বেশি। দক্ষিণে, দেউড়ির ফটক অবধি রাস্তার দু'ধারে ছিল বাহারে ফল পাতার গাছ।

নরনারায়ণ চৌধুরি এই অট্টালিকা ও বাগান তৈরি করেন-বীরভূম জেলায় ময়ুরাক্ষী নদীর পাশে এই গ্রামে। একশো বছরেরও বেশি আগে। চৌধুরিরা তখন এই অঞ্চলের জমিদার। রমরমা অবস্থা। বাগানের শখ চৌধুরিদের সবারই। দূর দূর দেশ থেকে গাছ এনে লাগানো হত। কিন্তু এখন অবস্থা পড়ে যেতে বাগানের আর যত্ন হয় না। ছোট বড় বুননা গাছ বেড়ে উঠেছে। নতুন চারাও আর লাগানো হয় না। আজ চৌধুরিদের জমিদারি গিয়েছে। ধান জমিও আছে ছিটেফোটা মাত্র। তবে চৌধুরিরা এখনও এই বাগানটা আঁকড়ে রেখেছে।

দোতলা চৌধুরি বাড়িটা দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাক দিয়ে। বাগানের মতোই তার অবস্থা আজ জীর্ণ। দেয়ালের পলেস্তারা খসেছে। দরজা জানলার রং উঠে গিয়েছে। সারি সারি জানলার কপাট বন্ধ—কোনোটা বা ভেঙেও গিয়েছে।

লোকজনের সাড়া মেলে না। মনে হয় বুঝি কেউ থাকে না।

ভূতুড়ে বাড়ি। শুধু অজস্র পায়রা, শালিক, টিয়াপাখির ডাকে মুখরিত। তবু লোক আছে।

পঁচাত্তর বছরের কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরি। তাঁর বিধবা কন্যা ও দুটি ছেলেমানুষ নাতি নাতনি এবং তাদের কাজের লোক বৃদ্ধ তারাপদ। এই বিরাট অট্টালিকার মধ্যে ওই গুটিকয়েক মানুষ কীভাবে দিন কাটায় কেউ তার খবর রাখে না। ওপরে তাকায় শিব। আম আর লিচুর ভারে ডাল নুইয়ে পড়েছে। এখন কাচা।

একটা আম নুন দিয়ে চাখব নাকি? লোভ হলেও ইচ্ছেটা দমন করে শিব। বুড়ো কেষ্ট চৌধুরি বেজায় বদরাগী। বাগানের ফলে কাউকে হাত দিতে দেয় না। বাগানে লোক ঢুকলেই তেড়ে যায়। তবে এখন ঘোর দুপুর। বুড়ো নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে।

অবশ্য শিব ইচ্ছে করলেই পকেট ভর্তি আম নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়তে পারে। চৌধুরিমশাই টেরটি পাবে না আসল অপরাধী কে?

গাঁয়ে এমন কোনো রসাল গাছ নেই যার ফল শিব চেখে দেখেনি। যার ডালে সে ওঠেনি। এ জন্য বাড়িতে নালিশও হয়েছে কয়েকবার। বাবার কাছে শাস্তিও পেয়েছে।

তবে ক্লাস টেনে ওঠার পর শিব নিজেই এই ফল-টল চুরি কমিয়েছে। নিজেকে এখন সে বড় বড় ভাবে। সামনের বছর স্কুল ফাইনাল দেবে। দোষ করলে বাবার হুকুমে কান। ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেই সব চেয়ে তার মানে লাগে। বিশেষত সাত বছরের ছোট বোনের চোখের সামনে। তার চাইতে বরং ঘা কতক দিয়ে দিক আড়ালে, তাও সয়। | ইস, দেবুটা এল না। চৌধুরি বাগানে ঢুকতে ও চায় না। দেবুর প্রপিতামহ মানে ঠাকুঁদার বাবা ছিলেন চৌধুরিদের নায়েব। কিন্তু এখন চৌধুরিদের সঙ্গে দেবুদের বিশেষ বনিবনা নেই।

ডালে ডালে শিবের নজর ঘুরছে। খুঁজছে কাঠবেড়ালির ছানা। অনাথ একটা কাঠবেড়ালির বাচ্চা পুষেছে। কী সুন্দর। কেমন তার সারা গায়ে ঘুরে বেড়ায়। ক্লাসে অবধি নিয়ে আসে। তাই শিব হন্যে হয়ে খুঁজছে কাঠবেড়ালি। আজ রবিবার, ছুটির দিনে সেই খোজে এসেছে।

কচি বাগদী বলেছে, চৌধুরি বাগানে সে কাঠবেড়ালির বাচ্চার ডাক শুনেছে।

কিছু কিছুকিছু—একটা মোটাসোটা লেজফুলো কাঠবেড়ালি মুখে কী জানি নিয়ে সামনে আমগাছটার একটা ফোকরে ঢুকল। তারপর বেরিয়ে এল। ফের কিছুক্ষণ বাদে সে খাবার নিয়ে ঢুকল গর্তে। খাবার রেখে বেরিয়ে এল। নির্ঘাৎ ওই গর্তে ওর বাচ্চা আছে। খাবার দিয়ে আসছে।

শিব কান পাতল। কিন্তু কাঠবেড়ালির বাচ্চার ডাক বুঝতে পারল না। কচির মতো কান নেই তার। ওরা ঠিক ধরে। বার কয়েক ব্যাপারটা লক্ষ করে উঠল শিব। আম গাছটা বেয়ে

চড়তে শুরু করল তরতর করে। ফোকরটা বেশ উঁচুতে। লক্ষ্যে পৌঁছনো তত সহজ হল না। মাঝামাঝি যেতেই ছুটে এল ধেড়ে কাঠবেড়ালি। মা-বাবা হবে বোধহয়। গায়ের রোয়া ফুলিয়ে দাঁত খিচিয়ে কী তার গর্জন! দিল বুঝি কামড়ে। এই সঙ্গে কোথেকে জুটল কয়েকটা কাক। বোধহয় বাসা আছে গাছে। কা কা না করে মহা শোরগোল তুলল তারা। সে বেরিয়ে যায় মাথার পাশ দিয়ে। মতলব ঠোকরাবার।

শিব একটু একটু করে ওঠে আর হাত ছুড়ে ভয় দেখিয়ে আক্রমণ ঠেকায়। গর্তে কাছাকাছি পৌঁছেছে।

হঠাৎ-

এই ছোঁড়া, গাছে উঠেছিস কেন? নাম্ শিগগির।—হুংকার শুনে চমকে শিব দেখে নিচে। স্বয়ং কেষ্ট চৌধুরি। মুখ তুলে দাঁড়িয়ে। চৌধুরিমশায়ের গায়ে ফতুয়া, খাটো ধুতি, পায়ে শুড়তোলা চটি। মাথা জোড়া টাক চকচক করছে। ফর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল। নাকে ভোললা গোল চশমার ওপর দিয়ে কটমট করে শিবের দিকে তাকিয়ে আছেন। এককালে সুপুরুষ ছিলেন। এখন শরীর ভেঙে গেছে—শীর্ণ কুঁজো।

হাতে বেতের লাঠিটা উচিয়ে আবার হুংকার ছাড়লেন চৌধুরি—নাম বলছি বদমাইস কোথাকার। আম চুরি ? দেখাচ্ছি মজা।

খানিক হতভম্ব হয়ে থাকে শিব। একবার ভাবল কিছুটা নেমে গুড়ি থেকে এক লাফে মাটিতে পড়ে মারবে দৌড়। তারপর ভাবল, আমি তো আর চুরি করতে আসিনি। বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। ভালোভাবে চলে যেতে দেবে।

খুব ভদ্র ভাবেই জানাল শিব,—আজ্ঞে, আমি আম পাড়তে আসিনি। কাঠবেড়ালির বাচ্চা খুঁজছিলাম।

ফের মিথ্যে কথা, গর্জন ছাড়েন চৌধুরি : গাঁয়ের ছেলেগুলো সব গোল্লায় গিয়েছে। বাপ মায়ের শিক্ষা নেই। লেখাপড়ার বালাই নেই। কেবল টো-টো আর চুরি চামারি।

কথাটা গায়ে লাগল। শিব দৃঢ়স্বরে বলল, “আজ্ঞে আমি পড়াশোনা করি। ক্লাস টেন-এ পড়ি। আর বলছি তো আমি আপনার আম চুরি করতে আসিনি।

তবে রে আবার তক। তোকে আজ পুলিশে দেব। বল তোর বাপের নাম কী?—চৌধুরি আগুন হয়ে লাঠি নাড়িয়ে শাসাতে থাকেন কান ধরে নিয়ে যাব তোর বাপের কাছে।

শিব দেখল বেগতিক সত্যি থানা পুলিশ হলে বা বাবার কাছে নালিশ গেলে তার দুর্ভোগ,আছে। তার কথা হয়তো বিশ্বাস করবে না কেউ। সে সুড়সুড় করে নেমে

আট দশ হাত ওপরে থাকতে মারল লাফ। মাটিতে পড়েই দে ছুট। রে—রে-করে কয়েক পা তেড়ে গেলেন চৌধুরি। কিন্তু ও ছেলেকে ধরা তার কম্ম নয়। শিবের কানে পিছন থেকে ভেসে এল কিছু কটুবাক্য।

চৌধুরির চোখের আড়াল হয়ে শিব গতি কমিয়ে হনহনিয়ে চলল হেঁটে। রাগে তার মাথা ঝা ঝা করছে। এর শোধ নিতে হবে।

উঃ! শিব দত্তকে কখনও এমন অপমান সইতে হয়নি—আর কিনা স্রেফ বিনা অপরাধে। আজ রাতেই সে চৌধুরি বাগান সাফ করে দিতে পারে। কিন্তু তাহলে কেষ্ট চৌধুরি ঠিক তাকেই দায়ী করবে। তার বাড়িতে নালিশ জানাবে। হাজার হোক চৌধুরি মশাই মানা লোক। তার বাবা বেজায় চটে যাবেন।

দেবুকে চাই। হ্যা, দেবু, তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। শিবের সঙ্গে পড়ে। দেবু শান্তশিষ্ট। ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়, শিবের মতো ডানপিটে নয়। কিন্তু দেবুর দুষ্টবুদ্ধি দারুণ। বাইরের কেউ না জানুক শিব জানে। ও কতবার লোককে জব্দ করেছে, কেউ টেরটি পায়নি।

শিবের মাথা গরম। বুদ্ধির প্যাচের চেয়ে তার হাত চলে বেশি। কিন্তু এই জায়গায় তা করে লাভ নেই। চৌধুরি মশাইকে জব্দ করতে হবে অন্য কোনো উপায়ে। দেবু ঠিক জুতসই কিছু বাতলাবে।

দুই

কী রে পাগলের মতো চললি কোথায়? – দেবুর গলা শুনে শিব থমকে দাঁড়ায়। দেখে, অশ্বথ গাছের গোড়া ঘিরে বাঁধানো গোল বেদিটায়, গাছে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে দেবু। হাতে একটা বই। ছায়ায় বসে বই পড়ছে।

-তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। বলল শিব।

কেন? - শিবের চোখ মুখের ভাব দেখে দেবু বলল: বস্ বস্। কী হয়েছে?

খোলা বইয়ের ভাঁজে একটা শুকনো অশ্বত্থ পাতা রেখে চিহ্ন দিয়ে মুড়ে রাখল দেবু। শিব একনজরে দেখল বইয়ের মলাটটা—ভয়ংকর দাঁত বারকরা বিরাট এক সাপের ছবি। নাম-পদ্মরাগ বুদ্ধ। নির্ঘাৎ কোনো অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্য গল্প। দেবু এইসব গল্পের পোকা। কোত্থেকে যে জোটায়!

বেশি গল্পের বই পড়লে বাড়িতে আপত্তি করে। তাই ছুটির দিনে লুকিয়ে এইখানে পড়ছিল। বইটা চেয়ে নিয়ে পড়তে হবে। এসব বই পড়তে তারও খুব ভালো লাগে। তবে সময় করে উঠতে পারে না বেশি।

বেদিতে বসে ফোস ফোস করে নিঃশাস ছেড়ে শিব বলল, “ওই কেষ্ট চৌধুরি।

-কেন? কী হল? শিব গড়গড় করে বলে যায় তার হেনস্তার কাহিনি। সব শুনে দেবু বলল, হু।

—হহু, মানে?

—মানে ভদ্রলোককে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—আলবাৎ। কিন্তু কীভাবে?

—দেখি ভেবে। ব্যস শিব নিশ্চিন্ত। সে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। দেবু গম্ভীর মুখে ভাবতে বসে। ভূতের ভয় দেখাব?

—ধড়মড় করে উঠে বলল শিব। -কীভাবে?

—রাতে ওর বাড়িতে ইট পাটকেল ছুড়ব। সাদা কাপড় জড়িয়ে বাগানে ঘুরব রাতে, বিকট ডাক ছাড়ব নাকি সুরে।

নীরবে ঘাড় নাড়ল দেবু, গাঁয়ে হইচই হবে। ধরা পড়ে যাবি। হতাশ হয়ে ফের গড়িয়ে পড়ে শিব।

পেয়েছিস কিছু?—লাফিয়ে উঠল শিব।

—মাথায় এসেছে একটা। আচ্ছা চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের ব্যাপারটা শুনেছিস?

– শুনেছি বইকি। কেষ্ট চৌধুরি নিজেই তো জাক করে বলেছেন কতজনকে। আমার কাকার কাছেই বলেছেন একদিন। চৌধুরিদের এক পূর্বপুরুষ নাকি ওই বাড়িতে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন। সেটা খুঁজে পেলেই ফের ওদের অবস্থা ফিরে যাবে। যত গুলতাপ্পি।

নারে, গুল নয়। হয়তো সত্যি।দেবু বলে: বিষ্ণু চৌধুরি, মানে এই কৃষ্ণ চৌধুরির বাবা নাকি লুকিয়ে রেখেছিলেন অনেক ধনরত্ন। দেশভ্রমণে গিয়ে তিনি হঠাৎ মারা যান। বাড়ির কাউকে বলে যাননি সেই গুপ্তধনের হদিশ। আমার কর্তাবাবা মানে ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন বিষ্ণু চৌধুরির নায়েব। তিনি হয়তো জানতেন খোজ। কিন্তু বিষ্ণু চৌধুরি দেশভ্রমণে যাওয়ার মাস খানেক বাদে তিনি হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে গত হন। তিনিও এ বিষয়ে কিছু বলে যেতে পারেননি। বাড়িতে এসব গল্প কিছু কিছু শুনেছি। গায়ে অনেকেই দেখেছি, বিশ্বাস করে এসব কথা। ঠিক আছে, এটাকেই কাজে লাগাব। এখন যা। আজ দুপুর তিনটের সময় আসিস। তাল পুকুরের ধারে, তেঁতুল গাছটার নিচে। তখন ফাইনাল হবে।

তাল পুকুরের পাশে ঝকড়া তেঁতুল গাছটার নিচে শিব দুটো থেকেই হাজির। জায়গাটা একদম নির্জন। শুধু দু-একটি বউ-ঝি বাসন নিয়ে আসছে মাজতে। দূরে কয়েকটা রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছে। গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে শুয়ে শিব আকাশ পাতাল ভাবে, কী কৌশল ভাবছে দেবু? কিছুই সে আঁচ করতে পারে না।

হেলতে দুলতে দেবু এল ঠিক তিনটেয়। বসল গাছের নিচে। হল?—শিবের আর তর সয় না।

জবাব না দিয়ে দেবু জামার বুক পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করে শিবের হাতে দিয়ে বলল, “দেখ।

কাগজখানা খুলে তাকিয়ে শিবের ভুরু কুঁচকে গেল। এ আবার কী! এক্সারসাইজ খাতার সাদা পাতায় অদ্ভুত কিছু নকশা। কালি দিয়ে আঁকা। তার মুখ দিয়ে বেরল,-ধুস।

ভালো করে দেখ। কিছু বুঝতে পারিস?—দেবুর স্বর গম্ভীর।

এবার খুঁটিয়ে নজর করল শিব।—পাতা জোড়া চৌকো দাগ। তার ভিতর এক কোণে আধ ইঞ্চি লম্বা ছোট্ট এক আয়তক্ষেত্র। আয়তক্ষেত্রের নিচে লেখা—বাগানঘর। চৌকো দাগের চারপাশে, চারটি অক্ষর—উ দ পু প। একটা সরু জোড়া দাগ চৌকোর মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত গেছে। চৌকোর ভিতরে কতগুলো একই ধরনের ছবি ছাতার মতো। তার ভিতর কিছু কিরিকিরি দাগ। শিব বুঝল গাছ। তার ছোট বোন এইভাবে গাছ আঁকত।

চৌধুরি বাড়ির নকশা নাকি? চৌধুরিদের বাগানের কোণে একটা মস্ত ভাঙাচোরা ঘর আছে। বাসের অযোগ্য। ওটার নাম নাকি বাগানঘর। সরু জোড়া দাগ বোধহয় ফটক অবাধ রাস্তার চিহ্ন। ছাতার মতো গুলো বোধহয় বাগানের গাছ। যদিও সবকটা একই রকম দেখতে। উ দ পু প মানে নিশ্চয় উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম। দুটো গাছের ডালপালা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। তাদের একটার নিচে লেখা—আম। অন্যটার নিচে লিচু।

আমগাছটার এক জায়গায়, দুটো ডালের জোড়ে লাল কালি দিয়ে ছোট্ট গোল আঁকা। এই দুই গাছের মাঝে একটা সোজা দাগের যোগ। দাগের গায়ে লেখা : ৪০। নকশার নিচে দুটো ইংরিজি অক্ষর-v.c.। বুঝছিস কিছু?—দেবু জিজ্ঞেস করে।

—মনে হচ্ছে নকশা। চৌধুরি বাগানের।

—আর কিছু?

গুপ্তধনের নকশা নাকি?

তাই মনে হচ্ছে? বাঃ! তবে তো মার দিয়া কেল্লা! গুপ্তধনটা কোথায় আছে ধরতে পারছিস?

নকশাটা আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে শিব বলল,- এই লাল গোল চিহ্নে। মনে হচ্ছে এখানে—তাই বোঝাচ্ছে।

কারেক্ট। ব্যস, তোর যা মনে হচ্ছে অন্যদেরও তাই হবে।

—কিন্তু এই নকশা বানাল কে?

—আমি। -কেন?

—দেখতেই পাবি। আচ্ছা আমাদের পলাশপুরে চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামায় কে কে? মানে, কথাটথা বলে এই নিয়ে?

কেন রে?

—মাথামুন্ডু বোঝ না শিব।

—আহা বল না ছাই।

বলছি পরে কারণটা। একটু ভেবে শিব বলল,-মদন দাস। —হুঁ, চলবে। লোকটার টাকার খাই আছে। আর?

—শ্রীপতি চাটুজ্যে।

—উহু, চলবে না। বেজায় কুঁড়ে। মোটে উজুগি নয়। কেবল চণ্ডীতলায় বসে আড্ডা মারে। তারপর?

-বাঁকা ঘোষ। একদিন কাকার কাছে চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের গপ্পো করছিল।

—বেশ, বেশ। লোকটা ধান্দায় ঘোরে, চলবে। আর? আর নাম চট করে মনে আসে না শিবের।

রেগে গিয়ে বলে,-হেঁয়ালি রাখ। তোর মতলবটা কী?

গাঁয়ের লোককে গুপ্তধনের নকশা গছাব। মানে যারা এর লোভ ছাড়তে পারবে। —ঠিক খুঁজবে। -তোর এই নকশা দেখে লোকে বিশ্বাস করবে কেন?

দূর বোকা, তাই কী করে। বিশ্বাস করবে এমন নকশা দেখাব। আমার বাড়িতে পুরনো আমলের অনেক বই খাতা কাগজ আছে। সেই কত্তা বাবার আমলের। নিচের তলায় একটা গুদাম ঘরে আছে। এক আলমারি ভর্তি বই—বাংলা, ইংরিজি ও সংস্কৃত ভাষায়। জ্যোতিষ শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, পুরাণ কত রকম বই। গল্পের বইও আছে। আর আছে কত্তা বাবার নিজের হাতে লেখা কয়েকখানা খাতা। লাল কাপড়ে মোড়া এত্তবড় খেড়োর খাতার সাইজ। তাতে কবিতা, মজার ছড়া, ধাঁধা, গুরুগম্ভীর রচনা, গান কত কী লেখা। কয়েকটা খাতায় আছে হিসাবপত্র। আলমারিতে চার পাঁচ সেট বাঁধানো পুরনো পত্রিকাও আছে—বঙ্গদর্শন, সখা আর মুকুল পত্রিকা। একটা বড় কাচের দোয়াত আর দুটো পালকের কলম আছে। ওই খাতা থেকে সাদা পাতা কেটে নেব। তাতে নকশা আঁকব খাগের কলম দিয়ে। সেই নকশা রেখে দেব জালায় চালের ভিতর। কিছুদিন থাকলে কালির দাগ খুব পুরনো মনে হবে—পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের বলে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যাবে। শুনেছি এইভাবে দলিল জাল করে পুরনো বলে চালায়। সেই নকশা দেখলে কারও আর সন্দেহ থাকবে না।

—কিন্তু এতে লাভ?

—হবে, হবে, দেখবি। মাসখানেক টাইম নেব। তদ্দিনে আমটাম ভালোই পাকবে। চৌধুরি বাড়িটা একটু লুকিয়ে দেখে খোজটোজ নিয়ে নকশা বানাব। তুই বরং গোপনে খবর নে, কে চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের কথা খুব বিশ্বাস টিশ্বাস করে।

দেবু বলেছে বটে কিন্তু ব্যাপারটা যে কী দাঁড়াবে এবং তাতে চৌধুরিমশায়ের উপর কীভাবে শোধ নেওয়া যাবে শিবের মাথায় বিশেষ ঢুকল না। আর বেশি জিজ্ঞেস করতেও ভরসা হয় না। দেবু চটে যাবে। তাকে বুদ্ধ বলবে।

কিন্তু একটা কৌতুহল যে না মিটলেই নয়,—আচ্ছা এই দুটো গাছের মাঝে দাগের গায়ে চল্লিশ লেখা। মানেটা কী? দূরত্ব।বলল দেবু। —চল্লিশ ইঞ্চি, ফুট না গজ? —সেটাই তো রহস্য। কেউ জানে না। শুনে শিব হাঁ। তারপর আমতা আমতা বলে, “আচ্ছা নকশার নিচে এই ইংরিজি অক্ষর দুটোর মানে?

ভি এবং সি। অর্থাৎ ইংরিজি বানানে বিষ্ণু চৌধুরি নামের প্রথম দুটো অক্ষর। অর্থাৎ এই নকশা যে স্বয়ং বিষ্ণু চৌধুরি বানিয়েছেন তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

তিন

সকাল প্রায় সাতটা। মদন দাস তার বাড়ির সামনে বসে বিড়ি খাচ্ছেন।

বছর চল্লিশ বছর। খাটো কৃষ্ণবর্ণ কুমড়ো গড়ন। খালি গা। লুঙ্গি পরা। গলায় কণ্ঠি। দাড়ি-গোঁফ চাঁচাছোলা। তেল চুকচুকে পাট করা চুল। সবাই জানে মদন দাস মহাজনা কারবারে বেশ দু পয়সা করেছে। বেজায় কিপটে।

শিব রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মদন দাসের সামনে থমকে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করল। তারপর মদন দাসের কাছে গিয়ে ডাকল, মদন কাকু।

-কীরে? আতিক হারু পাত্র দু মাস সুদ ঠেকায়নি। হারুর বাড়ির ওপর নজর রেখে বসে ছিলেন মদন দাস। হারু বেরলেই আজ ধরতে হবে। হারুর দরজা থেকে চোখ না সরিয়ে জবাব দিলেন মদন দাস।

এই একটা জিনিস। মানে লেখা। মানে পেয়েছি। ঠিক বুঝছি না। ভাবছিলাম কাকে দেখাই। শিব জামার বুক পকেট থেকে দু-ভাজ করা একটা বিবর্ণ কাগজ বের করে এগিয়ে দেয়।

বেশ বিরক্ত হলেন মদন দাস। আঃ, এ ছেলেটা আবার কেন জুটল? এখন হারুর বেরুবার টাইম। নেহাত দত্ত বাড়ির ছেলে। তাই স্রেফ হাঁকিয়ে দিতে পারলেন না? আড়চোখে হারুর বাড়ির ওপর পাহারা রেখে বললেন—কই দেখি।

কাগজটা খুলে এক নজর দেখেই চমকে গেলেন মদন দাস। এ কী! খুব পুরনো নকশা মনে হচ্ছে। অদ্ভুত। চৌধুরি বাড়ির নাকি? বাগান ঘর আর কোথায় আছে তাছাড়া? এগুলো কি বাগানের গাছ? আম গাছের ডালে এই লাল গোল চিহ্নটার মানে?

এ-এটা তুই কোত্থেকে পেলি? -মদন দাসের চোখ টিউবলাইটের মতো জ্বলতে শুরু করেছে।

—আমি পাইনি। দেবু।

—দেবু? মজুমদার? প্রফুল্লদার ছোট ছেলে?

-হ্যা।

—ও কোত্থেকে পেয়েছে?

—ওদের বাড়িতে ওর ঠাকুর্দার বাবা মানে অমূল্যভূষণের অনেক পুরনো কাগজপত্র আছে। তার ভিতরে পেয়েছে। ও কিছু বুঝতে না পেরে আমায় দিল। আমিও তো কিছু বুঝছি না ছাই, মাথা-মুন্ডু। কোনো বাড়ির নকশা নাকি? আচ্ছা চৌধুরি বাগানে একটা বাগানঘর আছে না?

মদন দাস খাড়া হয়ে বসেন। অমূল্যভূষণ! মানে জমিদার বিষ্ণু চৌধুরির নায়েব! বিষ্ণু চৌধুরির গুপ্তধন। একি সেই গুপ্তধনের নকশা? হতে পারে।

যখন অমূল্যভূষণ মারা যান বিষ্ণু চৌধুরি তখন বিদেশে। বিষ্ণু চৌধুরি আর ফিরলেন

খবর এল এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। হয়তো তিনি বিশ্বাসী নায়েবের কাছে জমা রেখে গিয়েছিলেন গুপ্তধনের নকশা। এমনি একটা কী বলেছিল বটে। VC. এই অক্ষর দুটোর মানে কী, বিষ্ণু চৌধুরি?

–কিছু বুঝলেন কাকা?

উহু! ভালো করে দেখতে হবে। এটা আমার কাছে থাক। বোধহয় জমি জায়গার নকশা। চৌধুরি বাড়ির হতেও পারে। নাও হতে পারে। তবে আধাখেচড়া কাজ। শেষ করা হয়নি। বলতে বলতে মদন দাস কাগজটা টুক করে লুঙ্গির ভঁজে লুকোলেন। নিতাই আসছে পথ দিয়ে।

শিবের পিঠে হাত বুলিয়ে মদন দাস বললেন, ঠিক আছে, তুই এখন যা। আমি উঠি। কাজ আছে।

মদন দাসের মুখ দেখে, শিব বুঝল, টোপ গিলেছে।

বেলা প্রায় নটা।

গ্রামের সীমানা পেরিয়ে আল পথ ধরলেন বাঁকা ঘোষ। বাঁকা ঘোষের চেহারাটা চোখে পড়ার মতো। বয়স বছর পঞ্চাশ। তালটেঙা। রোগা। কুঁজো। মুখ লম্বাটে। ছোট বক মতো গোঁফের ওপর ঝুলে পড়েছে লম্বা নাকটা। কুতকুতে চোখে ধূর্ত চাউনি। সর্বদা খাটো ধুতি আর হাফশার্ট পরনে। আর শীত গ্রীষ্ম সব সময়ে হাতে একটা রঙচটা ছাতা। কেউ কোনোদিন ওঁকে সোজা হতে দেখেনি, তাই বাঁকা নামটাই চালু।

বাকা ঘোষের চাষবাস আছে। কিন্তু ওর রোজগারের আসল পথ দালালি এবং লোক ঠকানো। পয়সার গন্ধ পেলে ও পারে না এমন কাজ নেই।

বাকা ঘোষ হাটে চলেছেন। এক ভালোমানুষ চাষি, মেয়ের বিয়ের বাজার করবে। বাঁকা তাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, রামপুরহাট বা সাঁইথিয়ার হাট নয়, তোমায় আমি খোদ কলকাতায় নিয়ে যাব। বড়বাজারে। দেখবে কত সস্তায় কেনাকাটা হয়। সস্তায় হতে পারে বটে তবে লাভের গুড় বাঁকা খাবেন। বেচারা চাষির কলকাতায় যাওয়ার হয়রানি হাবে সার। সেই চাযির সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার ব্যাপারটা পাকা করার আশায় বাঁকা চলেছেন হাটে।

-জেঠু। ডাক শুনে পিছনে তাকিয়ে বাঁকা দেখলেন, মণিময় দত্তর ছেলে শিব। কখন ছেলেটা পিছু নিয়েছে খেয়াল করেননি। তিনি বললেন, কীরে? কোথায় চললি?

আজ্ঞে, পারুল ডাঙা। জেঠু এই একটা জিনিস। ভাবছিলাম, কাকে দেখাই। আপনাকে পেয়ে গেলাম, ভালোই হল। —শিব বুক পকেট থেকে একটা ভাজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দেয়: এই যে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নকশা নাকি?

যেতে যেতেই হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে এক নজর দেখেই থমকে গেলেন বাঁকা।

কী এটা! খুব পুরনো নকশা মনে হচ্ছে। হু, চৌধুরি বাড়ির। বাগানঘর, পদ্মদীঘি। দক্ষিণের ফটক, সব মিলে যাচ্ছে। এগুলি কি গাছের চিহ্ন? হারে শিব, এটা তুই কোত্থেকে পেলি! - প্রশ্ন করলেন বাঁকা ঘোষ।

আজ্ঞে, দেবুর কাছে। ওদের বাড়িতে একটা গুদাম ঘরে ওর কর্তাবাবা মানে অমূল্যভূষণের আমলে অনেক কাগজপত্র জমে আছে। ও সেখানে পেয়েছে। ও বলছিল, এটা চৌধুরি বাড়ির নকশা হতে পারে। বাগানঘর লেখা রয়েছে। আচ্ছা, এই লাল গোল। দাগটার মানে কী? তার পাশে সাত লেখা কেন? দেবু কিছুই বুঝতে পারছিল না কীসের নকশা। আমি চেয়ে নিলাম।

হুম। বাঁকা ঘোষের মাথায় বিদ্যুৎ খেলল। বিষ্ণু চৌধুরির গুপ্তধনের নকশা নাকি? হতে পারে। দেশ ভ্রমণে যাওয়ার সময় নকশাটা বিশ্বস্ত নায়েবের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। বিষ্ণু চৌধুরির ছেলেগুলো ছিল উড়নচণ্ডী। ওদের মায়ের কাছে নকশা রেখে গেলেও ঠিক তারা বাগিয়ে ফেলত এবং সব উড়িয়ে দিত। জমিদার নায়েব দু'জনেই ফট করে মারা গেলেন। তাই নকশার কথাটা জানল না কেউ। এই লাল কালিতে গোল দাগটা কি গুপ্তধনের হদিশ? ব্যাপারটা দেখতে হবে তল্লাশ করে।

নকশাটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে বাঁকা বললেন, ঠিক বুঝচি না কীসের। পরে দেখব এখন।

চটপট পা চালালেন বাঁকা।

বাঁকা ঘোষের যাওয়ার দিকে মিটমিট করে খানিক তাকিয়ে থেকে শিব খুশিমনে পারুলডাঙা চলল। ওখানে হারুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঘণ্টাখানেক পর ফেরা যাবে। দু'দিন বাদে দেবু রিপোর্ট নিল।

—সব কটা প্ল্যান লেগেছে?

একটা বাদে।-বলল শিব।

—কে?

—ভজহরি মণ্ডল।

—দেখে টেখে ফেরত দিল। বলল, বাজে।

—বেশ ওটা নিয়ে পচা মিস্ত্রিকে ট্রাই করো। পচা না ধরলে মাধাই পাল। আচ্ছা তোর সঙ্গে রতিয়ার ভাব আছে?

—হু, আছে। এই তো গত মাসে দু'জনে মিলে নদীর ধারে জঙ্গলে একটা শজারু মারলাম।

—তোর কথা শোনে রতিয়া ?

—আলবৎ।

-বেশ। রতিয়াকে ডেকে আন্। আজই বিকেলে তেঁতুল তলায় একা।

-কেন? -কথা হলেই বুঝবি। রতিয়া বায়েন-দের ছেলে। শিবের বয়সি। প্রাইমারি স্কুলে দু-জনে কিছুদিন পড়েছে একসঙ্গে। রতিয়া অবশ্য পড়া ছেড়ে দিয়েছে। গরিবের ছেলে। মাঠে খাটতে হয়। গরু চরাতে হয়। পড়াশোনার সময় কোথায় তার। ছেলেটা দুর্দান্ত এবং বাউন্ডুলে। শজারু মারা, বেজির বাচ্চা ধরা—এসব কাজে ওর জুড়ি নেই। আগে শিব ওর সঙ্গে মাঠে ঘাটে কেবল টই টই করত। এখন আর অত মেশা হয় না। তবু নতুন কিছুর সন্ধান পেলেই রতিয়া এসে চুপিচুপি খবর দিয়ে যায়। দু’জনে কখনও কখনও অভিযানেও বেরোয়।'

রতিয়াকে কি কাজে লাগাতে চায় দেবু?

চার

বেলা দু-প্রহর।

সন্তর্পণে চৌধুরি বাগানে ঢুকল মদন দাস। পিছনে পিছনে বছর বারো তেরোর একটি ছেলে। ছেলেটা রোগা টিংটিঙে। পরনে শুধু মালকোচা মেরে পরা একটি গামছা।

মদন দাস তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলেন পশ্চিম ধারের গাছগুলোকে। আম এবং লিচু গাছ দু-সারি। প্রত্যেক সারিতে দশটা গাছ। একটা আম, পাশেরটা লিচু। এইভাবে পোতা। সারির প্রত্যেকটা গাছের দূরত্ব প্রায় সমান।

ফতুয়ার পকেট থেকে গজ ফিতে বার করলেন মদন দাস। নকশায় আছে ডাইনে লিচু গাছ থেকে বাঁয়ে আম গাছের দূরত্ব চল্লিশ।

কিন্তু কী চল্লিশ। ফুট না গজ? ফুটই হবে বলে মনে হচ্ছে। চল্লিশ হাতও হতে পারে, চল্লিশের পাশে আবার দুটো এমন আবছা অক্ষর যে পড়াই যাচ্ছে না।

মদন দাসের ধারণা বিষ্ণু চৌধুরির নকশায় আম গাছের ডালে লাল গোল চিতে অর্থ-ডালের ওইখানে কোনো ফোকরের ভিতর লুকনো আছে গুপ্তধন। এখন ঠিক গাছটাই বের করাই মুশকিল। সত্তর আশি বছর আগের সেই ডালের ফোকর এখন কী অবস্থায় আছে কে জানে? হয়তো বা বুজে গিয়েছে। দেখে শুনে খুঁজে বের করতে হবে। ইতিমধ্যে আর কেউ পেয়ে গিয়েছে কি? বোধহয় না। তাহলে ঠিক রটে যেত।

কোন আম গাছটা? নকশায় দেখে বোঝার জো নেই। দেখা যাক মেপে। এছাড়া উপায় কী?

এই গুটে, ধর ফিতেটা।

একদিকে মদন দাস, অন্যদিকে সেই ছেলেটা ফিতে ধরে প্রথম সারির আম ও লিচু গাছগুলির মধ্যে দূরত্ব মেপে চলে।

একটা উনচল্লিশ ফুট। আর একটা আটতিরিশ ফুট। এই দুটোই সবচেয়ে কাছাকাছি। অতি প্রাচীন সব গাছ। গুড়িগুলো প্রকাণ্ড মোটা। হয়তো তখন দুই

গাছের দূরত্ব চল্লিশ ফুট ছিল। গুড়ির আয়তন বেড়ে এখন উনচল্লিশ বা আটত্রিশে দাঁড়িয়েছে। আপাতত প্রথম সারির এই দুটো গাছেই চেষ্টা করা যাক।

গুটে, এই আমগাছটায় ওঠ।—হুকুম দিলেন মদন 'দাস। গুটে সুরসুর হাত দিয়ে মস্ত মোটা গুঁড়িটা আঁকড়ে গিরগিটির মত তরতর করে গাছ। বেয়ে উঠতে লাগল। | মদন দাস বললেন, “দেখ তো গুড়ি থেকে দ্বিতীয় ডালের জোড়ে কোনো ফোকর আছে কিনা?

—অ্যাই! কেরে? হুংকার শুনে আঁতকে উঠলেন মদন দাস। খেয়েছে।

চৌধুরি বাড়ির দোতলায় একটা জানলা ফাক করে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কেষ্ট চৌধুরি!

টপ করে ঝোপের আড়ালে বসে পড়লেন মদন দাস। চৌধুরি মশায়ের চোখ গুটের দিকে। মদন দাসকে দেখেননি।

দিবাকর। এই দিবাকর। আম পাড়ছে। ধর ছেলেটাকে।বলতে বলতে চৌধুরি মশায়ের মুখ জানলা থেকে সরে যায়। বাড়ির ভিতর থেকে হাঁকডাক ভেসে আসে। কেষ্ট চৌধুরি আসছেন নিচে।

মদন দাস উঠে মারলেন দৌড়। ঝোপের আড়ালে গিয়ে পাঁচিল পেরিয়ে ওধারে। তারপর জোর হাঁটা। হাঁপাচ্ছেন। ঘামছেন দরদরিয়ে। কী করে বুঝব খিটকেল বুড়ো ভর দুপুরে না ঘুমিয়ে জানলা দিয়ে বাগান পাহারা দেয়।

গুটে ছোঁড়ার কী হল কে জানে? ধরা না পড়লেই বাঁচি। নাঃ পালাবে ঠিক। বেটাকে আগাম পঁচিশ পয়সা দিয়েছিলাম।—গেল জলে।

রোববার ফের চেষ্টা করা যাবে। ওই দিন সকালে কেষ্ট চৌধুরি হাটে যায়। ফিরতে বেলা হয়। আমি আর ঢুকছি না ভিতরে। বাগানের বাইরে থাকব। গুটেকে গাছে চড়া। গাছের ফোকরে যদি কোনো বাক্স টায় মেলে, নিয়ে এসে দেবে আমায়।

কেষ্ট চৌধুরির চিৎকার কানে এল। আম চোরের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করছেন। মদন দাস ভাবেন, ভাগ্যিস দেখেনি আমায়। গুটেকে ধমকে দিতে হবে,-ধরা পড়লে খবরদার আমার নাম করবি নে বা এই খোজাখুজির কথা বলবি নে। বরং

স্বীকার করে নিবি আম পাড়তে গিছলি। তার জন্যে দু ঘা খেলে সে আমি পুষিয়ে দেব।

অনেক তফাতে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শিব সমস্ত ব্যাপারখানা দেখছিল। এবার সে ছুটল দেবুর কাছে।

মার দিয়া কেল্লা!—শিবের সে কী উল্লাস: ওঃ, চৌধুরি মশাই যা খেপেছিল, যদি দেখতিস। বাগানময় লাঠি ঘুরিয়ে লাফাচ্ছেন আর চিল্লাচ্ছেন। চোর ধরতে না পেরে বেচারি দিবাকরকেই বকতে লাগলেন।

গাছে কে উঠেছিল। মদন দাস?—দেবু জিজ্ঞেস করে।

—দূর ! ওই মোটা গাছে উঠবে কি? ওর বাগাল গুটেকে তুলেছিল। দেবু ঘটনা সব শুনে বলল, -ও আবার ট্রাই করবে। তক্কে তক্কে থাক।

অন্দরমহলের বারান্দায় বসে লণ্ঠন জ্বেলে পড়ছিল তপু। চারদিক একেবারে নিঝঝুম। শুধু দেওয়াল ঘড়ির টিটিক আর ঘুলঘুলিতে আশ্রয় নেওয়া পায়রাদের মৃদু ছটফটানির শব্দ।

বাড়িতে সবাই ঘুমাচ্ছে। এক ঘরে দাদু। অন্য ঘরে মা এবং দিয়া। পাশেই তপুর বিছানা। বারান্দায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে দিবাকরদা। বেশি পড়া থাকলে তপু এমনি খাওয়ার পর রাতে বসে পড়ে। সোয়া দশটা। উঃ, চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে।

তপু ঘরে ঢুকল। টেবিলে বই আর শিখা কমানো লণ্ঠনটা রেখে একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি আসবে কি? জানলাটা বন্ধ করে শুই। নইলে বৃষ্টি এলে ছাঁট ঢুকবে ঘরে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল বাগানে একটা আলোর ঝিলিক। না, বিদ্যুৎ নয়। আবার আলোটা জ্বলছে নিভছে!

তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে তপু। বাগান ঘরের ভিতর থেকে আসছে আলোটা। হ্যা তাই। কীসের আলো? কে ওখানে?

তপুর বুক ধড়াস ধড়াস করে। বাগানে ফল চুরি করতে এসেছে কেউ? না, চোর ডাকাত দুষ্টলোক ওখানে আস্তানা গেড়েছে? কী করবে? দাদুকে ডাকবে? নাঃ।

কাল একটা ছেলে আম চুরি করছিল দুপুরে। তাই নিয়ে চেঁচামেচি করে দাদুর ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। ভালো ঘুম হচ্ছে না।

—দিবাকরদা। ও দিবাকরদা।। তপুর চাপা ডাকে দিবাকর চোখ খোলে, -কী? কী হয়েছে?

—একবার এসো আমার সঙ্গে।

দিবাকরের বয়েস হয়েছে। এখন চোখে কম দেখে। কানেও ভালো শোনে না। বুকে সাহস কমে নি। সে উঠে পড়ল।

আলো। বাগান ঘরে। ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বলল দিবাকর।

– কেন? কি হয়েছে ওখানে? দিবাকর মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই খারাপ লোক। নইলে জঙ্গলে পোড়ো ঘরে ঢকরে কে এত রাতে। বাইরে কিন্তু তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলল,-কে জানে। একটা হাঁক দিই পালাবে।

—কিন্তু দাদু যে চমকে জেগে উঠবে। দাদুর শরীর খারাপ।

‘হু—দিবাকর ভেবে পায় না কী করবে। সদর দরজা খুলে নিচে গিয়ে দুজনে চোর তাড়ানোও খুবই বিপজ্জনক।

গুন্ গুপ—একরকম অদ্ভুত চাপা শব্দ কানে আসে। আবছা আলো দেখা যাচ্ছে বাগান ঘরের ভিতরে।

দিবাকর ভরসা হারায়, বাবুকে ডাকি।

দাদুকে ঘুম থেকে তুলে মোলায়েম ভাবে ব্যাপারটা জানাল তপু। যেন তিনি সহসা উত্তেজিত না হন। যেন কিছুই নয়। তারা এক্ষুনি ব্যবস্থা করছে। তবে চেঁচামেচি হলে দাদু যদি চমকে জাগে তাই ডাকা, বলে রাখা।

বাইরে শান্ত দেখাতে চেষ্টা করলেও কৃষ্ণ চৌধুরি মনে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। একী উৎপাত। নিশ্চয় চোর। ফল চোর। দিনে সুবিধে না হওয়ায় রাতে এসেছে।

কিন্তু শব্দটা কীসের? বড় অসহায় লাগে তার। একদিন চৌধুরি বাগানে না বলে ঢোকার মতো বুকের পাটা ছিল না কারো? আর আজ? বাড়িতে একটিও সমর্থ পুরুষ নেই।

মা আর দিয়াকেও জাগিয়ে ছিল তপু। যথা সম্ভব অভয় দিল। মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তবে দিয়া এক লাফে জানলায় এসে মহা কৌতূহলে বাইরে দেখতে থাকে।

চোর চোর!—সমবেত কণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকার দিল তপু, দিবাকর, দিয়া এবং চৌধুরি মশাই। , অমনি বাগানের আলোটা গেল নিভে। তারপর ঘরের কাছ থেকে দ্রুত সরে যেতে থাকে আলোটা। জ্বলছে নিভছে। দ্রুত সেটা মিলিয়ে যায় চোখের আড়ালে। তপুরা সমানে চেচাচ্ছে। এই বিশাল এলাকার গাছপালা ভেদ করে আর্তনাদ কি বাইরে পৌছবে?

মিনিট পনেরো বাদে কয়েকটা আলো দেখা গেল। কয়েকজন ঢুকল বাগানে। তাদের হাতে টর্চ লণ্ঠন এবং লাঠি-সোটা। দলের সামনে বাঁকা ঘোষ। তার হাতে টর্চ এবং শাবল।

কী হয়েছে?—বাকা ঘোষ চেঁচান। দিবাকর ছাদ থেকে জবাব দেয়, বাবু, বাগানে লোক ঢুকেছিল। আলো ফেলছিল ওই বাগান ঘরে। কীসের শব্দ হচ্ছিল। | সাহস বটে বাঁকা ঘোষের। তৎক্ষণাৎ তিনি একাই সোজা বাগান ঘরের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভিতরে টর্চ ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে জানালেন,—কই কেউ নেই। পালিয়েছে।

আগাছা জঙ্গল ভেদ করে ওই ঘরের মধ্যে ঢোকার ইচ্ছে নেই কারো। সাপখোপ থাকতে পারে। বাইরে থেকেই ভিতরটা দেখা যাচ্ছে বেশ। কেউ নেই ঠিকই।

সদলবলে বাকা ঘরের চারধারে ঘুরে দেখলেন। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। গায়ের বদমাশ ছেলে ফল চুরি করতে এসেছিল। নারকেল বা ডাব কাটছিল বোধ হয়।

—বললেন বাঁকা। অন্যরা সায় দিল।

চৌধুরিবাড়ির কাছে গিয়ে বাঁকা হেঁকে বললেন,—নিচে নামবার দরকার নেই। আমরা দেখলাম খুঁজে কেউ নেই। কিছু হলে চিৎকার দিও। ভয় নেই। আমরা

আছি। চৌধুরি মশাই ঘুমিয়ে পড়ুন নিশ্চিন্তে।

ফিরে যেতে যেতে বাকা ভাবলেন, হতভাগা বুড়ো। রাতেও ঘুমোয় না। দুপুরেও তো জেগে জেগে বাগান পাহারা দেয় শুনেছি। মেঝের এক জায়গায় খোড়া হয়েছে। ওই লাইন। বরাবর আরও গর্ত করতে হবে। ঠিক কোথায় গুপ্তধনটা লুকানো আছে নকশা দেখে বোঝার উপায় নেই। শুধু বোঝা যাচ্ছে বাগান ঘরের মেঝেতে দক্ষিণ দেওয়াল থেকে সাত ফুট তফাতে। আর সাত হাত হলেই গেছি। এবার সাবধানে গর্ত করতে হবে—যেন শব্দ বেশি না হয়। ভাবতেই পারিনি ওই বাড়ি অবধি আওয়াজ পৌঁছবে। মনে তো হল সব নিশুতি! ঈহ বা পাটা যা জ্বলছে। পালাতে গিয়ে ছড়ে গিয়েছে শেয়াল কাটায়।

বাঁকা ঘোষ বলে গেলেন বটে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে কিন্তু সে রাতে চৌধুরি বাড়িতে কারওরই তাড়াতাড়ি ঘুম এল না। আশঙ্কা উত্তেজনায় চৌধুরি মশায়ের মাথাটা দপ দপ করে।

সকালে বাগানে বেড়াচ্ছিলেন কৃষ্ণ চৌধুরি। হঠাৎ মানিক দত্তর মুখোমুখি।

মানিকের বয়স বছর তিরিশ। ছোটখাটো রোগা। সম্পর্কে শিবের দাদা। তবে আলাদা বাড়িতে থাকে। মহা ধড়িবাজ। শিব জানে, বাবা যখন বাড়ি থাকে না তখন এসে মানিকদা তার ভালো মানুষ মায়ের কাছে "কাকিমা কাকিমা" করে নাকি কেঁদে প্রায়ই দু-চার টাকা লুকিয়ে বাগিয়ে নিয়ে যায়। সব বাজে ওজর। নেহাত জানাজানি হলে মা বকুনি খাবে তাই সে বাবার কাছে লাগায়নি। মায়ের কত কষ্টে জমানো পয়সা। শিব তাই দু'চক্ষে দেখতে পারে না ওকে। মানিক দত্ত হেট হয়ে চৌধুরির পায়ের ধুলো নিয়ে বলল,আজ্ঞে ভালো আছেন?

—আর ভালো। বয়স হয়েছে। এবার কোনদিন ভালোমন্দের বাইরে চলে যাব।

হেঁ হেঁ কী যে বলেন। আপনার এখনও স্বাস্থ্য চমৎকার।

তারপর এখানে! কী ব্যাপার? -বাগানে কাউকে ঢুকতে দেখলেই চৌধুরির সন্দেহ হয়।

-এই দেখছিলাম। ওঃ কী বাগান ছিল। আচ্ছা – এই টবগুলোতে কি গাছ ছিল?

যে কাকড় ফেলা রাস্তাটা বাগানের মধ্য দিয়ে চৌধুরি বাড়ি থেকে পাঁচিলের গায়ে গেট অবধি গিয়েছে, সেই পথের ধারে কাছাকাছি তিনটে চীনেমাটির ইটের ওপর বসানো। এখন গাছ নেই, খালি।

গোলাপ ছিল।—জবাব দেন চৌধুরি মশাই।

টবগুলো এখানেই আছে? মানে। আপনি কদ্দিন দেখছেন?

—তা ছোটবেলা থেকে।

ইস, কী দারুণ টবগুলো। কী চকচকে রং। কী দারুণ ডিজাইন। খুব দামি জিনি টবগুলো সত্যি সুন্দর। প্রায় তিন ফুট উঁচু। তেমনি আয়তন। গায়ে গাঢ় নীল নকশা।

চৌধুরি মশাই দেখতে দেখতে বলেন, —হুঁ।

জানেন, লাভপুরে একজন, বিনীতভাবে বলে মানিক: নতুন মস্ত বাড়ি করেছে। টবের গাছে বাড়ি সাজাচ্ছে। আমার কাছে খোজ করছিল পুরনো শৌখিন টব কোথায় পাওয়া যায়। এই টবগুলো দেখে লুফে নেবে। ভালো দাম দেবে। পড়েই তো আছে। দিন বিক্রি করে। বিক্রির নামে অহংকারে লাগলেও একটু চুপ করে থেকে চৌধুরি বললেন, -বেশ।

উৎফুল্ল হয়ে মানিক বলল, তাহলে একটু ধুয়ে মুছে সাফ করে দেখাতে হবে। দেখবেন কি জেল্লা খোলে। এমনি বাইরে পড়ে থাকা অবস্থা দেখলে কি আর এদের আসল রূপ বোঝা যায়। এখানে থাকলে তো ধুয়ে লাভ নেই। ফের নোংরা হয়ে যাবে। তুলে নিয়ে বারান্দায় শেডের নিচে রাখা যাক।

কে রাখবে? আমার লোক নেই।—জানালেন চৌধুরিমশাই।

সে আপনি ভাববেন না। আমি ব্যবস্থা করব।—বলতে বলতে জড়িয়ে ধরে একটা টবকে তোলার চেষ্টা করে।

হাঁ হাঁ করে ওঠেন চৌধুরি, আহা করছ কী? পড়ে যাবে গড়িয়ে। যাবে ভেঙে। ভীষণ ভারী। আবার মাটি জমেছে ভিতরে। এ তোমার কন্ম নয়।

জামা কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ মানিক বলল,—ঠিক আছে, আজ। বিকেলেই আমি লোক নিয়ে আসব।

এত ইন্টারেস্ট কীসের? চৌধুরি ভাবেন। দাঁও মারবে বোধহয়। তা নিক। টবগুলো কাজে লাগে না। বিক্রি করে যদি কিছু আসে।

আর মানিক দত্ত ভাবে, শিবের দেওয়া নকশা দেখাচ্ছে ঢাকেন গড়ন, মস্ত একটা টবের নিচে পোঁতা রয়েছে গুপ্তধন। কিন্তু কোনটার তলায়? তাই টবগুলো সরানো দরকার।

এমন টব আরও ছিল? জিজ্ঞেস করে মানিক। ছিল আরও দুটো। ঝড়ে গাছের ডাল পড়ে ভেঙে গিয়েছে। —বললেন চৌধুরি।

—আহা-হা। অমন জিনিস। কোথায় ছিল সে দুটো।

—ঠিক মনে নেই—কাছাকাছি ওইখানটায় হবে।

যা বাব্বা! কেস আরও ঘোরালো হল। ভাবল মানিক। এই গাছগুলো কী?-- একটা টবের পাশে দেখায় মানিক।

স্লাইডার লিলি।

“বাঃ সুন্দর ফুল। লাগাতে হবে।

-হ্যা। বাল্ব লাগাতে হয়। নিয়ে যেও তুলে। জঙ্গল হয়ে গিয়েছে।

হেঁ, হে, কী বাগানই ছিল। আর ওই টবটার কাছে ওটা কী ফুল? নেওয়া যায়?

-ওটা টাইগার লিলি। বেশ নিও একটা বান্ধ। বিকেলে সত্যি সত্যি মানিক একজন লোক এনে টব তিনটে তুলে বারান্দায় রাখল।

দিবাকর টব ধুয়ে মুছে চকচকে করল। কিন্তু আর মানিকের পাত্তা পাওয়া গেল না। চৌধুরি ভাবলেন, হয়তো লাভপুরের লোকটা টব কিনতে রাজি হয়নি। | কয়েকদিন বাদে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে একটা ব্যাপার দেখে অবাক হলেন চৌধুরি মশাই। টবগুলো যেখানে বসানো ছিল সেই তিন জায়গাই খোড়া। ইট সরিয়ে মাটি খোড়া হয়েছে। হাত দুই গভীর। কিন্তু এই তিন জায়গার মাটি খোড়ার কারণ? শুধু

তাই নয়, যে 'টবদুটো ভেঙে গিয়েছে, সেগুলো যেখানে ছিল সেই জায়গাতেও চারটে গর্ত।

চারদিন বাদে কৃষ্ণ চৌধুরির নামে একটা পোস্টকার্ড এল। কালি দিয়ে গোটা গোটা করে লেখা-"মহাশয় চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের সন্ধান চলছে। সাবধান!"

ব্যস, আর কিছু নেই। চিঠিটা লাভপুরে পোস্ট করা। চৌধুরি মশাই চমকে গেলেন। এ চিঠির উদ্দেশ্য? আমাকে খ্যাপানো? উত্তেজিত করা? ঠিক খবর? কে লিখেছে? কথাটা সত্যি হয়ে থাকলে সন্ধানটা করছে কে? কোনো হদিশ মিলেছে কি? বাড়িতে কিছু কিছু রহস্যজনক ঘটনার মূল কারণ কি এই? চৌধুরি ভেবে কূলকিনারা পেলেন না। চিঠির কথা জানালেনও না কাউকে।

পাঁচ

শিব প্রাণপণে খুঁজছে। পথের ওপর চোখ রেখে এক পা এক পা করে চলেছে। তার একটা পাঁচ টাকার নোট কোথায় পড়ে গিয়েছে। ছোটকাকা উপহার দিয়েছিল টাকাটা শিবের জন্মদিনে।

গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছে। দুপুরে বাংলা স্যারের কাছে কোচিং ক্লাস করতে গিয়েছিল শিব। তার ইচ্ছে ছিল ফেরবার সময় কালোর দোকানের বেগুনি খাবে। কিন্তু ফেরার পথে দেখে তাদের ক্লাসের ক'জন ছেলে মাঠে ফুটবল পিটছে। জুটে গেল সেও। বাড়ি ঢোকার একটু আগে মনে পড়ল—টাকাটা? বাংলা বই হাতড়ে দেখল নোটটা নেই। খেলতে নামার আগে নোটখানা পকেট থেকে বের করে বাংলা বইয়ের ভিতরে রেখেছিল। আসতে আসতে বই উল্টো করে ধরেছিল কখন, টাকা পড়ে গিয়েছে।

শিবের মনে ভারি আপশোস। ভেবেছিল পঞ্চাশ পয়সার বেগুনি খাবে আর বাকি পয়সা দিয়ে একটা পেন কিনবে। দাসুর দোকানে একটা চমৎকার পেন দেখে রেখেছে। চার টাকা দাম। মাঠের ধারে পড়লে কি আর পাবে টাকাটা? ঠিক কেউ তুলে নেবে।

উল্টো দিক থেকে একটা ছেলে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে পড়ল। কৃষ্ণ চৌধুরির নাতি—তপু। নাইনে পড়ে। ফর্সা রোগা সুন্দর দেখতে। ভালোমানুষ স্বভাব। শিব ওকে চেনে। তবে তেমন ভাব নেই। কী খুঁজছ শিবদা? তপু জিজ্ঞেস করল।

—একটা নোট পড়ে গিয়েছে।

—কত টাকার ?

—পাঁচ।

এইটে বোধহয়। —তপু একটা পাঁচটাকার নোট বের করে: পঞ্চানন তলায় মন্দিরের পাশে পড়েছিল।

হ্যা। ওখান দিয়ে এসেছি।

—শিবনোটটা ছিনিয়ে নেয়: এই তো কড়কড়ে, ঠিক আমারটার মতো। ওঃ বাঁচা গেল।

তপুর মুখও খুশিতে ভরে ওঠে। শিব স্কুলের নামজাদা ছেলে। স্কুল টিমের হট ক্যাপ্টেন। দারুণ স্পোর্টসম্যান। তাকে খুশি করতে পেরে তপু কৃতার্থ।

শিব তপুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, - থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ, আমি তো ভাবলাম গোল গচ্চা।

ছেলেটা সত্যি ভালো, শিব ভাবল। আর কারও নজরে পড়লে ঠিক মেরে দিত।

পরদিন শিব তপুকে ডাকল,—চল কালুর দোকানে বেগুনি খেয়ে আসি। আমি তোকে খাওয়াব।

তপু আপত্তি জানায়, না-না।

—আরে লজ্জা কী? তুই টাকাটা খুঁজে দিলি। এ তোর পাওনা।

তবু তপুর সংকোচ। শিব জোর করে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

দেবুর সঙ্গেও তপুর ভাব হল। নোটের ব্যাপারটা শুনেছিল দেবু। তপু ছেলেটি ভারি ভদ্র। তবে কেমন মনমরা ভাব। দেবুর কৌতুহল, তপুর কাছে চৌধুরি বাড়ির গুপ্তধনের ব্যাপারটা জানতে হবে।

কদিন বাদে এক বিকেলে তপুকে নদীর ধারে পেয়ে গল্প করতে করতে দেবু পাকড়ে ধরল। হারে তপু, তোদের বাড়িতে নাকি গুপ্তধন আছে?

তপু শুরু করে:

দাদুর বাবা বিষ্ণু চৌধুরি মারা যান মাত্র চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে। উনিশশো নয়-দশ সাল নাগাদ। খুব বুদ্ধিমান কমী পুরুষ ছিলেন। কলকাতায় কলেজে পড়েছেন। রেল কোম্পানিকে পাথর কুঁচি সাপ্লাই করে অনেক টাকা রোজগার করেন। জমিদারি বাড়ান। খুব দেশ ভ্রমণের শখ ছিল তাঁর।

একবার পূর্ববঙ্গে বেড়াতে গেলেন। দু'মাস পরে খবর এল মেঘনা নদীতে ঝড়ে নৌকো ডুবি হয়ে মারা গিয়েছেন। তখন আমার দাদুর বয়স মাত্র পাঁচ বছর। দাদুর ওপরে দুই দাদা, তিন দিদি। যাওয়ার সময় দাদুর বাবা নাকি তার স্ত্রীকে বলে যান—কিছু সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছি। যদি আমার কিছু হয়, মানে যদি না ফিরি, নায়েব মশাই তা বের করে ভাগ করে দেবেন। উনি জানেন কোথায় রেখেছি।

লুকিয়ে রাখার কারণটাও বলেন। এর কিছুদিন আগে চৌধুরি বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা . হয়। যদি ফের ডাকাতি হয়। যদি ডাকাতরা সিন্দুক ভাঙে। যাতে সর্বস্বান্ত না হতে হয় তাই এই ব্যবস্থা। তখন নায়েব ছিলেন শ্রী অমূল্যভূষণ মজুমদার। দাদুর বাবা ওঁনাকে বড় ভাইয়ের মতো দেখতেন। নিজের স্ত্রী পুত্রের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করতেন।

অমূল্যভূষণ আমার কর্তাবাবা। মানে ঠাকুর্দার বাবা। খুব পণ্ডিত বিচক্ষণ লোক ছিলেন। বলল দেবু।

ঠা শুনেছি। বলল তপু: কিন্তু দুঃখের বিষয় দাদুর বাবা দেশ ভ্রমণে যাওয়ার মাসখানেকের মধ্যে নায়েব মশাই হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি কাউকে এ বিষয়ে কিছু বলে যাননি। দাদুর বাবার দুঃসংবাদ আসার পর সেই লুকোনো ধনরত্নের অনেক খোজাখুজি হয় কত। পাওয়া যায় নি। আজও পাওয়া যায়নি। দাদুর দুই দাদা ছিলেন বেজায় খরচে বিলাসী। তাদের জন্যই জমিদারি নষ্ট হল। জমি জায়গা বিক্রি হয়ে গেল। শেষে তারা সম্পত্তি টাকাকড়ি ভাগাভাগি করে নিয়ে কলকাতায় বাস করতে থাকেন। শুধু দাদুই পড়ে রইলেন এখানে।

তোরা এখানে এলি কেন?—জানতে চায় দেবু: আগে কোথায় ছিলি?

তপু বলল, নানুর ওখানে। বাবা মারা যাওয়ার পর কাকারা খুব খারাপ ব্যবহার করছিলেন। তাই দাদু নিয়ে এলেন।

তোর দাদু কিন্তু বড় রাগী।—বলল শিব।

—আগে এমন ছিলেন না, মা বলে। শরীর খারাপ। অভাব। তাই।

—তোর মামা মামিরা আসে না?

একজনই তো মামা। আমেরিকায় থাকে। ছোটমাসি থাকে কলকাতায়। বড়মাসি কানপুরে। মাসিরা আসে কদাচিৎ, ওই পুজোর সময়। দু-তিন দিনের বেশি থাকে না। এখানে ইলেকট্রিক আলো নেই। অসুবিধা হয়। আচ্ছা তোদের গুপ্তধনের কোনো নকশাটক্সা ছিল?—দেবু জিজ্ঞেস করে।

-কই শুনিনি তো!

পরদিন স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে সকাল ন'টার সময় বাড়ি ফিরছিল শিব। পথে তপুর সঙ্গে দেখা। কীরকম উস্কোখুস্কো চেহারা।

শিব বলল,—কোথায় চললি তপু?

অমনি তপু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। শিব থ, কী হয়েছে? চোখ মুছে তপু বলল,—দাদুর ভীষণ শরীর খারাপ।

—কী হয়েছে?

—খুব মাথায় যন্ত্রণা। ছটফট করছে। কাল রাতে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। তাই নিয়ে ---

—আঁ চোর!

-হা বৈঠকখানা ঘরে। ও ঘরের দেওয়ালে তিনটে হরিণের শিং টাঙানো আছে। মাথাসুদ্ধ শিং। বেশ উঁচুতে। তারই একটা ফেলেছিল। শব্দে আমরা জেগে যাই। খুব হইচই হয়। তারপরই দাদু অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিংটার পাশেই দেওয়ালে একটা মৌচাক হয়েছে। হয়তো মৌমাছির আক্রমণে শিংটা ফেলে দেয় চোরে। খুব মৌমাছি উড়ছিল ঘরে।

চোর! নির্ঘাৎ পচা মিস্ত্রি! ভাবল শিব। ওর নকশায় আছে বৈঠকখানায় হরিণের মাথার ভিতরে গুপ্তধন। তবে ঠিক কোনটার ভিতরে বোঝননা নেই।

তপু বলল,—দাদুর শরীরটা কিছুদিন ধরেই ভালো যাচ্ছে না। সারাদিন জেগে বাগান পাহারা দেয়। আবার এমনি সব কাণ্ড। একটুও রেস্ট হয় না। তোর দাদুর বড় বাগানের-বাই। কেউ ঢুকলেই যা তেড়ে আসেন।—শিব খোচা দিল।

আসলে দাদুর হাত প্রায় খালি। ওই বাগানের আয়ে মানে ফল বিক্রি করে আমাদের অনেকখানি সংসার খরচ ওঠে। দিবাকরদা বুড়ো হয়েছে। চোখে ভালো দেখে না। ওকে দিয়ে পাহারা হয় না। তাই দাদু নজর রাখে। আমরা বারণ করলেও শোনে না।

–এখন কোথায় যাচ্ছিস?

মদন দাসের বাড়ি। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। কয়েকটা ওষুধ লিখে দিয়েছেন, লাভপুর থেকে আনতে হবে। হাতে একদম পয়সা নেই। মা একটা কানের দুল দিল সোনার। মদন দাসের কাছে বন্ধক রেখে টাকা নেব। তারপর ওষুধ কিনতে যাব।

তপু চলে গেলে শিবের ভারি কষ্ট হল। ইস, ওর দাদুর যদি কিছু হয়, ভেসে যাবে বেচারিরা!

নাঃ! এই উৎপাত থামাতে হবে। কিন্তু কী করে?

দেবু শিবের মুখে সব শুনে বলল, সত্যি বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। এবার এই উৎপাত থামানো দরকার। চৌধুরি মশায়ের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

—কিন্তু কীভাবে?

—দেখি ভেবে। গাংডাগোলের কেস।

' —যদি গিয়ে সবাইকে সিধে বলি, মজা করছিলাম, —ওসব বাজে নকশা?

—তোর পিঠের ছাল তুলে নেবে। সব গিয়ে তোর বাড়িতে নালিশ করবে। বুঝবি। ঠেলা।

তা বটে।—শিব মুষড়ে পড়ে।

একটু ভেবে বলল দেবু, – ঠিক আছে একটা দিন টাইম দে। হ্যা একটা কথা মনে পড়ল। আমার সেই পিসতুতো দাদা, সেই যে গত বছর পুজোয় এখানে বেড়াতে এসেছিল। তিনদিন ছিল। কলকাতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে কাজ করে। মাস তিনেক আগে আমায় একটা চিঠি দিয়েছিল। ওর এক বন্ধুর কিউরিওর ব্যবসা আছে। মানে পুরনো আমলের শৌখিন জিনিস কেনাবেচা করে। পিন্টুদা লিখেছে—চৌধুরিরা তো পুরনো ফ্যামিলি। ওদের বাড়িতে তেমন পুরনো জিনিস আছে কিনা খোঁজ নিতে। যেমন—ঝাড়লণ্ঠন, কাচ পাথর, চীনামাটির পাত্র, মূর্তি, ফার্নিচার, নকশা ভোলা কথা এমনি সব জিনিস। যদি চৌধুরিরা বিক্রি করতে রাজি থাকে পিন্টুদার বন্ধু এসে জিনিস দেখবে। পছন্দ হলে ভালো দাম দিয়ে কিনবে। এতদিন এই নিয়ে আমি গা করিনি। তা তপুদের যখন টানাটানি, দেখ না জিজ্ঞেস করে। ওসব জিনিস এখন কি আর কাজে লাগে? পড়ে পড়ে নষ্ট হয়।

রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ।

মদন দাস যথারীতি তার বাড়ির সামনের রোয়াকে বসে বিড়ি টানছেন। নজর রাখছেন খাতকরা কেউ পেরোয় কিনা। যদি কিছু সুদ আদায় হয়। নইলে অন্তত তাগাদা লাগাব। এমন সময় শিব গিয়ে সামনে দাঁড়াল।

—কী? কাচুমাচুভাবে শিব বলল, -মদনকাকু সেই নকশাটা, আপনাকে দিয়েছিলাম।

–ও হা। ভুলে গিয়েছি। আর দেখাই হয়নি। দেখব।

দরকার নেই। মানে ওটা বাজে। দেবু রগড় করতে গিয়েছিল আমায়।

অ্যা। মদন দাসের চোখ ছানাবড়া।

আজ্ঞে হ্যা। দেবুটা মহাপাজি। ভেবেছিল আমায় খুব ঠকাবে। ওটা নাকি গুপ্তধনের নকশা। চৌধুরি বাগানের। দেবুই ওটা বানিয়েছে। ভেবেছিল আমি খুঁজে মরব, মানে ওই নকশা দেখে। একটা ডিটেকটিভ বই দেখে বানিয়েছিল নকশাটা। গতকাল বলে কিনা, পেলি গুপ্তধন? যখন শুনল, আমি বুঝতেই পারিনি, আপনাকে দিয়েছি দেখতে, যা দমল না ---- হেঁ হেঁ। আজ নকশাটা ওকে ফেরত দিয়ে বলব—আমার গুপ্তধন চাই না, বরং তুই খুঁজে নে।

মদন দাস গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকে নকশাখানা হাতে নিয়ে এসে শিবকে দিলেন। একটিও কথা বললেন না।

শিব বলল,-ভাগ্যিস আপনি সময় নষ্ট করেননি এটা নিয়ে। আমার ভারি লজ্জা করছিল।

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে মদন দাস বললেন, - আরে দূর! আমার দেখেই সন্দেহ হয়েছিল—বাজে।

শিব এবার চলল বাঁকা ঘোষের উদ্দেশে। রবিবার বাঁকা ঘোঘ হাটে যায়। পথে ধরতে হবে। তারপর মানিক দত্ত এবং পচা মিত্তিরের পালা।

বিকেলে অশ্বথ বেদিতে গিয়ে শিব দেখল, দেবু অপেক্ষায় বসে। তার মুখ নড়ছে। হাতে এক ঠোঙা বেগুনি। শিব যেতেই ঠোঙা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, -নে একেবারে হাতে গরম।

টপ করে একটা বেগুনি তুলে কামড় দিয়ে শিব দু-খানা নকশা আঁকা কাগজ পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিল।

দেবু বলল, —আর দুটো?

ধরেছিলাম। দিল না। বলল, হারিয়ে গিয়েছে। ওঃ মানিকদা যা খেকাল না। এই মারে কি সেই মারে। বলে, ইয়ার্কি হচ্ছিল। শাসিয়েছে, আমার বাবাকে বলে দেবে।

উহু, দেবে না।—বেগুনি খেতে খেতে নিশ্চিন্ত মুখে জানাল দেবু। কারণ লোকে তাহলে বুঝে ফেলবে ও কেন টব সরিয়েছে। সবাই হাসবে। ওর প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে। এই আর এক রাউন্ড বেগুনি আন। বলেছিলি যে, প্ল্যান সাকসেসফুল হলে খাওয়াবি।

'যাক উৎপাত থামল। শিব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু উৎপাতের আরও কিছু বাকি ছিল। শিবু বা দেবু কারওরই সে দিকটা খেয়াল হয়নি।

একটু বাদে তপু এল। দেবু বেগুনির ঠোঙা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “নে। একেবারে হাতে গরম।"

তপু বলল, পুরনো আমলের অনেক দামি শৌখিন জিনিস আমাদের বাড়িতে আছে বইকি। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু দাদুকে বিক্রির কথা বলতে আমার ভয় হয়। এখন জিনিসের ওপর ওর খুব টান। যদি রেগে যান শুনে? উত্তেজনা হলে শরীর খারাপ হবে। ভেবেছি দু-চারদিন বাদে মাকে দিয়ে বলিয়ে রাজি করাব। সত্যি জিনিসগুলো সব নষ্ট হচ্ছে। একে একে হারিয়েও যাচ্ছে।

কী কী আছে? দেবু জিজ্ঞেস করল।

সে অনেক কিছু। কাচ আর পোর্সিলিনের সুন্দর সুন্দর বাটি প্লেট। কাঠের মোমবাতি স্ট্যান্ড—দারুণ কাজ করা। পিতলের বড় বড় পিলসুজ। দুটো মস্ত ঝাড় লণ্ঠন আছে সাজঘরে। কী চমৎকার দেখতে। দাদুর ঘরে সিন্দুকেও অনেক পুরনো জিনিস আছে।

সাজঘর! তোদের বাড়িতে সাজঘরও আছে নাকি? কোথায়? - দেবু প্রশ্ন করে।

–খিড়কি সিড়ির মুখে দোতলায়।

সাজঘর কী?—শিব জানতে চায়।

তপু বলল,—এ ঘরে নানারকম সাজপোশাক থাকত। যেমন, ঘোড়ার সাজ, হাতির সাজ। বাড়িতে অনেক হাতি ঘোড়া ছিল যে তখন, আর থাকত বাড়ি সাজাবার জিনিস শামিয়ানার রঙবেরঙের কাপড়। দেশি বিদেশি ছবি, বাতি, এখন অবশ্য কিছুই প্রায় নেই। যা আছে ছেড়াখোড়া নষ্ট। উৎসবে বাড়ি সাজানোও আর হয় না।

তোদের সাজঘরেও কি এইসব আছে?—শিব জিজ্ঞেস করে দেবুকে।।

—নাঃ। আমাদেরটায় ছিল যাত্রার পোশাক। যাত্রায় লাগে এমন মুকুট, তিরধনুক, তরোয়াল, বর্শা। আমার ঠাকুর্দার দুই ভাই ছিলেন যাত্রা পাগল। এখন অবশ্য ওসব কিছুই নেই। এখন ওটা আমার পড়ার ঘর। তবে নামটা রয়ে গিয়েছে।

—আচ্ছা তপু, তোর দাদুর বাবা মানে বিষ্ণু চৌধুরির হাতের লেখা আমায় দেখাতে পারিস। বাংলায় কোনো চিঠি? কেন?—দেবুর বেখাপ্পা প্রশ্নে তপু অবাক।

-এমনি। দাদুর কাছে আছে হয়তো। কিন্তু—বোঝা গেল এই বিষয়ে দাদুকে বলতে তপুর দ্বিধা হচ্ছে ।

—এই দু-এক লাইন হলেই হবে। তপু একটুক্ষণ ভেবে বলল, কয়েকটা বই দেখেছি। বাংলায় ওর নাম সই করা। —বেশ। কাল আনিস একখানা। একবার দেখব।

পরের দিন তপু একখানা বই দিল দেবুর হাতে। বইটার আসল মলাট নেই। চামড়া দিয়ে চমৎকারভাবে বাঁধানো। বইয়ের নাম—কপালকুণ্ডলা। লেখক-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মলাটের পরের পৃষ্ঠায় বাঁকা গোটা গোটা অক্ষরে সই—শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ চৌধুরি। নামের নিচে তারিখ—১০ই ভাদ্র, ১৩০২। বইয়ের পাতাগুলো 'লালচে হয়ে গেছে।

দেবু সইটা দেখল। বইয়ের পাতা ওলটাল। তারপর বলল, বইটা একদিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। কাল ঠিক ফেরত দেব।

পরদিন তপুর বই ফেরত দিয়ে দেবু বলল, তপু ঝাড়লণ্ঠন দুটো একবার আমায় দেখাবি?

ওগুলো আনা শক্ত। বড্ড ভারী যে। তপু আমতা আমতা করে।

-না না আনতে হবে না। আমি গিয়ে দেখব। লুকিয়ে দেখে চলে আসব।

আমিও যাব।—শিব দৃঢ়স্বরে জানায়। দেবুর আচরণে সে রহস্যের গন্ধ পায়। কিন্তু লুকোচ্ছে ও।

বেশ। তবে নিয়ে যাব, কাল দুপুরে। -বলল তপু।

সাত

পরদিন সকালে এক কাণ্ড ঘটল।

নন্দস্যারের কাছে পড়ে ফিরছে শিব। হঠাৎ কানে এল শোরগোল চেঁচামেচি। চৌধুরি বাড়ির দিকে। শিব দৌড়াল।

চৌধুরি বাড়ি পৌঁছে শিব ভ্যাবাচ্যাকা। সাত আটটা হনুমান চৌধুরিদের বাগানে চড়াও হয়েছে। তারা পাকা পাকা আম খাচ্ছে মহা আনন্দে। যত না খাচ্ছে নষ্ট করছে ঢের বেশি। দু-এক কামড় খায় আর ছুড়ে ফেলে দেয়। | গাছের নিচে চৌধুরি মশাই, তপু, দিবাকর। তপুর বোন দূরে দাঁড়িয়ে। তপু আর দিবাকর প্রাণপণে ঢিল ছুড়ছে। চৌধুরি মশাই লাঠি তুলে ভয় দেখাচ্ছেন। চিৎকার করছে সবাই মিলে।

হনুমানগুলো এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফাচ্ছে। ঝাকি দিয়ে আম ফেলছে। কিন্তু পালাবার লক্ষণ নেই। মাঝে মাঝে আবার দাঁত খিচোচ্ছে। আম ছুড়ছে নিচে মানুষদের তাক করে। মজা দেখতে বাগানের বাইরে একগাদা গ্রামের লোক জুটেছে। কিন্তু তারা হনুমান তাড়াতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করছে না।

শিব দেখল, কিছুদূরে ঝোপের আড়ালে চারটে ছেলে -হি হি করে হাসছে। তাদের একজন হচ্ছে রতিয়া। শিব তাদের কাছে গেল।

শিবকে দেখে রতিয়া একগাল হেসে বলল,—দেখ শিবদা কেমন রগড়। ওঃ অদ্দিন তক্কেতকে ছিলেন। কাল খবর পেলেম পাশের গায়ে একপাল হনু এয়েছে। ভোরে গিয়ে তেইড়ে তেইড়ে নিয়ে এইছি। ঠিক তোমরা যেমনটি চেয়েছিলে। কথা রেখিছি। কাঁঠাল খাওয়াতে হবে কিন্তু। শিবের মনে পড়ে গেল, রতিয়ার সঙ্গে তাদের এক গোপন ষড়যন্ত্রের কথা।

সে ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, এবার তাড়িয়ে দে, বড় ক্ষতি করছে। তোদর কাঁঠাল খাওয়াব ঠিক।

রতিয়া বলল,—তা একটু শিক্ষা হোক। তোমায় অপমান করে। দেখো বুড়োটি কেমন নেত্য করছেন; কিসসু লাভ নেই। রামভক্ত বিছুর জাত। ঢেলা ঘোড়াকে ওরা গেরাহাই করে না। শুধু ভয় এই অস্তরটিকে—রতিয়া তার হাতের গুলতিটা দেখাল।

হা, হা সে সব মিটমাট হয়ে গিয়েছে। এবার তোরা হনু তাড়িয়ে দে। শিব কাতর অনুরোধ জানায়।

অমনি রতিয়ার দল রে-রে করে বাগানে ঢুকল।

গুলতি দেখামাত্র হনুমানের টনক নড়ল। তারা এগাছ ও গাছ লাফাতে লাফাতে বাগান

পেরিয়ে মাঠে নামল। তারপর লেজ তুলে লম্বা লম্বা লাফে খানিক ছুটে আবার উঠল অন্য গাছে। অদৃশ্য হল চোখের বাইরে। বতিয়ারা ঠায় তাদের পিছনে লেগে রইল। একেবারে গ্রাম পার করিয়ে দিয়ে আসবে বাবাজিদের। দুপুর আড়াইটে। চৌধুরি বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে সন্তর্পণে ঢুকল তপু, শিব এবং দেবু।

সবাই ঘুমুচ্ছে নাকি?—জিজ্ঞেস করল দেবু।

হ্যা।—তপু উত্তর দেয়।

—তোর দাদু? বাগান পাহারা দিচ্ছেন না?

—সকালে হনুমান নিয়ে হইহই করে দাদুর শরীরটা বেশ খারাপ। ডাক্তারবার এসেছিলেন। একদম রেস্ট নিতে বলেছেন। মা খুব রাগ করেছে। কী দরকার ছিল দাদর নিচে নামার?

সিড়ির মাথার দরজাটা খুলে উকি দিয়ে চারদিক দেখে তপু ইঙ্গিত করল,–এসো। পাশেই সাজঘর। দরজায় কড়ায় ঝুলছে প্রকাণ্ড এক তালা। তপু ফিসফিস করে বলল, —বন্ধ থাকে। আমি খুলে রেখেছি। দাদুর ঘর থেকে লুকিয়ে চাবি নিয়ে।

নিঝুম বাড়ি। টানা টানা বারান্দা। সার সার বন্ধ ঘর। পায়রার ববকুম আর শালিকের ঝগড়ার কিচমিচ আওয়াজ। সাজঘরের দরজার নিচে খানিকটা ভাঙা। দরজা ঠেলতেই শব্দ হল—কাচ।

তিনজনে ভিতরে ঢুকল। দরজাটা ভেজিয়ে দিল। অন্ধকার ঘর। তপু বাইরের দিকের জানলার কপাট একটু ফাক করে দিল। অল্প আলো ঢুকল ঘরে।

ছোট ঘর। উঁচু ছাদ। দেয়ালে পোঁতা অনেকগুলো মোটা মোটা হক। দুটো হুকের বাঁকানো মাথায় আটকানো অবস্থায় ঝুলছে দুটি মস্ত মস্ত ঝাড় লণ্ঠন। ঘরের কোণে একটা বড় কাঠের সিন্দুক। একধারে স্তুপ করা গাদা রঙিন কাপড়। দেওয়ালে ভোলোনো ফ্রেমে বাঁধাই বড় বড় তিনটে হাতে আঁকা ছবি। কয়েকটা আরশোলা উড়ল ফরফরিয়ে। বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ। দেবু পকেট থেকে একটা টর্চ

বের করল। আলো ফেলতে লাগল ঘরের চারধারে। ঝাড়লণ্ঠনের ওপর আলো পড়তেই ঝকমক করে উঠল। আলো ঠিকরালো স্ফটিকের মণ্ডের মতো দেখতে পলা কাটা কাচের ভাললারে। অপূর্ব দৃশ্য।

দেবু সব দেখছে খুঁটিয়ে। ছাদের কাছে একটা ঘুলঘুলি। দুটো ইট দিয়ে তার ফাক বোজানো। বোধহয় যাতে পাখি না বাসা বাঁধতে পারে। টর্চের আলো স্থির হল ঘুলঘুলির ওপর। তপু একটা মই জোগাড় করতে পারিস? বলল দেবু।

—মই! না কোনো মই নেই দোতলায়।

কেন? –ওই ঘুলঘুলিটা দেখব।

-একটা উঁচু টুল আছে বারান্দায়। ওটায় চড়লে হাত পাওয়া যেতে পারে।

-বেশ চল, নিয়ে আসি। তিনজনে ধরাধরি করে টুলটা আনে। ঘরে ঢোকায়।

টুলে চড়ল দেবু। এক পা টুলে অন্য পায়ে একটা হুকে ভর দিয়ে কোনোরকমে নাগাল পেল ঘুলঘুলির - নে।

দেবু ওপর থেকে পরপর দুটো ইট নামিয়ে দেয়। ধরে শিব। সে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছে না।

একটা থলি নিল শিব। রেশমি কাপড়ের মাঝারি থলি। সঙ্গে সঙ্গে দেবু লাফিয়ে মেঝেতে নামে। থলিটা শিবের হাত থেকে নেয়।

কী আছে থলিতে? ঝনঝন করছে! বেশ ভারী। ভর্তি।

থলির মুখটা ফাক করে দেবু ভিতরে টর্চের আলো ফেলে। চকচক করে ওঠে গোল গোল হলুদ রঙের চাকতি।

এক মুঠো বার করে এনে চোখের সামনে ধরে দেবু বলল,—মোহর। এ জিনিস আমি দেখেছি। আমাদের বাড়িতে আছে কয়েকটা। উত্তেজনায় তার গলা কাপছে, বিষ্ণু চৌধুরির গুপ্তধন। কী করে সন্ধান পেলি এখানে রয়েছে?—চেঁচিয়ে ওঠে শিব।

—একটা নকশা ছিল আলগা কাগজে, আমার কর্তা-বাবার গানের খাতার ভিতরে। তাতে আঁকা, একটা সিড়ি। সিড়ির পাশে একটা ঘর। ঘরের তলায় লেখা: সাজঘর। ঘরের দক্ষিণে দেওয়ালের মাথায় একটা চৌকো দাগ। ব্যস! আর কিছু নেই। ওই নকশাটা দেখেই বিষ্ণু চৌধুরির গুপ্তধনের নকল নকশা বানাবার আইডিয়া আমার মাথায় আসে। অবশ্য তখন জানতামও না আসল নকশা কিছু আছে কিনা। যা হোক, কর্তাবাবার খাতার ভিতরে পাওয়া নকশাটা ভেবেছিলাম সেটা কর্তাবাবারই আঁকা। আমাদেরই সাজঘরের নকশা। কিন্তু পরে অন্য সন্দেহ হল। বিষ্ণু চৌধুরির হাতের লেখার সঙ্গে সাজঘর শব্দটা মিলিয়ে বুঝলাম এ লেখা বিষ্ণু চৌধুরির। কর্তাবাবার নয়। যদিও দু’জনের হাতের লেখায় খুব মিল। বুঝলাম এটাই হয়তো আসল গুপ্তধনের নকশা। বিষ্ণু চৌধুরি রেখে গিয়েছিলেন তার নায়েকের কাছে। নাঃ আর কথা নয়। ফোকরে আরও কী কী সব আছে। হাতে ঠেকল। বের করি।

দেবু ফের টুলে চড়ল।

সে এক এক করে নামিয়ে দেয়—প্রথমে একটা বড় কাঠের হাত বাক্স। তারপর আরও একটা রেশমি থলি। ভর্তি। ঝমঝম করে বাজল। মনে হল তাতেও আছে মোহর। এরপর একটা চৌকো ভারী ধাতুখণ্ড।

হাত বাড়িয়েই নিচ্ছে শিব। হঠাৎ তার পায়ের পাতার ওপর শিরশিরানি। কিছু একটা উঠছে। বিছে নাকি?

আঁতকে উঠে পা ঝেড়ে লাফিয়ে ওঠে শিব। ঠাস করে ফেলে দেয় ধাতুখটা। দেবুও চমকালো। তার পায়ের তলা থেকে টুলটা গেল পিছলে। টলে পড়তে পড়তে সে এক লাফে নিচে নেমে আসে। কিন্তু টুলটা কাত হয়ে পড়ল মেঝেয়। জোরে শব্দ হল।

খানিকক্ষণ তিনজনে নিথর। নাঃ বোধহয় শব্দটা শোনেনি কেউ। তপুর দাদুর ঘর দোতলায় বটে, কিন্তু কিছু দূরে।

তারপর বাক্সটা খোলা হল। টর্চের আলোয় দেখা গেল, বাক্স ভর্তি নানারকম সোনার জড়োয়া গয়না। দামি দামি পাথর বসানো। দশ বারোটা হীরে মুক্তো বসানো আংটি। ঝকমক করছে আলো পড়ে। ভারী ধাতুখটা সোনার বাট। অন্তত এক কেজি ওজন।

তপু, এবার তোদের অবস্থা ফিরল। খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল শিব। ক্যাচ।

তিনজনে এত তন্ময় ছিল, যে দরজা খোলার আওয়াজ তাদের কানেই যায়নি। ঘরে হঠাৎ আলো বেড়ে যেতে তিনজনে ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ চৌধুরি!

তপু কী করছিস? কে এরা?—চৌধুরিমশাই গর্জন করে ওঠেন।

তপু কাঠ। চৌধুরি মশায়ের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি শিবের ওপর।

কী হল? জবাব দিচ্ছিস না যে? —গলার আওয়াজটা আর একমাত্রা চড়ল।

দাদু!—যেন সংবিৎ পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে তপু: এরা আমাদের গুপ্তধন আবিষ্কার করেছে। এই দেবুদা শিবদা। এই দেখ।

কৃষ্ণ চৌধুরি স্তম্ভিত! বাক্যহারা! নিস্পলক চোখে কয়েক লহমা তাকিয়ে রইলেন। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন ঘরের নোংরা মেঝেতে ছড়ানো সেই বিপুল ঐশ্বর্যের সামনে।